বঙ্গভবনে অন্যরকম ইতিহাস

প্রভাষ আমিন

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

পবিত্র ঈদুল ফিতরের একদিন পর, মানে ২৪ এপ্রিল বঙ্গভবনে ছিল বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের শপথ অনুষ্ঠান। নতুন রাষ্ট্রপতির শপথ অনুষ্ঠান একটি নিয়মিত আনুষ্ঠানিকতা। তবে এ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। বিদায়ী রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ তো ছিলেনই। নতুন রাষ্ট্রপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা, প্রধান বিচারপতি, মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য, সামরিক-বেসামরিক শীর্ষ কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। শপথের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে যায় মিনিট পাঁচ-সাতেকের মধ্যেই। তারপর আপ্যায়ন শেষে একে একে বঙ্গভবন ছাড়েন আমন্ত্রিত ১১০০ অতিথির প্রায় সবাই। আমন্ত্রিত সিনিয়র সাংবাদিকদের অনেকেও চলে যান।

তবে শপথের চেয়ে আমার বেশি আগ্রহ ছিল আবদুল হামিদের বিদায় নিয়ে। আগেই জেনেছিলাম, আবদুল হামিদকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানো হবে। যারা অনুষ্ঠান কাভার করতে এসেছিলেন, সেই সাংবাদিকরা তো ছিলেনই। আমরা অতি উৎসাহী কয়েকজন সাংবাদিকও অপেক্ষায় ছিলাম। আমরা আসলে ইতিহাসের সাক্ষি হতে চেয়েছিলাম। একজন রাষ্ট্রপতির বিদায় কেমন হবে, তার কিছু আনুষ্ঠানিকতা আছে। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, বাংলাদেশের ৫২ বছরের ইতিহাসে তেমন কিছু হয়নি। আবদুল হামিদ বাংলাদেশের ২১তম রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তার মানে তার আগে আর ২০ জন রাষ্ট্রপতি বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু কারো ক্ষেত্রে বিদায়ের আনুষ্ঠানিকতা হয়নি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। জিল্লুর রহমান রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। এরশাদ গণআন্দোলনের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। অন্তত তিনজনকে বিদায় নিতে হয়েছে বন্দুকের মুখে। বাকিদের বেশিরভাগই স্বল্প মেয়াদের ছিলেন। তবে এরশাদের পতনের পর গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা শুরুর পর রাষ্ট্রপতিরা আনুষ্ঠানিক বিদায় পেতে পারতেন। বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিএনপির মনোনয়নে রাষ্ট্রপতি হলেও দলের আস্থা হারানোয় তাঁকেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিদায় নিতে হয়েছে। তবে আবদুর রহমান বিশ্বাস, বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ এবং ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদের কপালে মেয়াদ পূর্তির সুযোগ এলেও অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি না থাকায় আনুষ্ঠানিক বিদায় তাদের কারো ভাগ্যেই জোটেনি। আবদুর রহমান বিশ্বাস বিএনপি আমলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেও বিদায় নিয়েছেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। আবার বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আওয়ামী লগের মনোনয়নে রাষ্ট্রপতি মনোনীত হলেও বিদায়টা হয়েছে নীরবে বিএনপি আমলে। আর ইয়াজউদ্দিন আহমেদ বিএনপির মনোনয়নে রাষ্ট্রপতি হলেও পরে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ায় সব পক্ষের আস্থা হারিয়ে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছে গ্লানির সাথে।

মানতেই হবে আবদুল হামিদ এক বিরল সম্মান পেয়েছেন। টানা দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপতি থাকার পর তিনি বঙ্গভবন ছেড়েছেন বিরল সম্মানের সাথে। ২৪ এপ্রিল নতুন রাষ্ট্রপতির শপথের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমন্ত্রিত অতিথিদের বিদায়ের সময় বিদায়ী রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বঙ্গভবনের গেটে দাঁড়িয়ে সবার সাথে কুশল বিনিময় করেন। সবার বিদয়ের পর তিনি বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে আসেন। প্রথমে তিনি বিদায়ী গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি হেঁটে এসে ফুলসজ্জিত একটি খোলা জিপে ওঠেন। সেখানে আগে থেকেই ছিলেন রাষ্ট্রপতির সহধর্মিনী রাশিদা খানম। সেই জিপের সঙ্গে বাঁধা ছিল লাল রঙের দুটি মোটা দড়ি। বঙ্গভবনের ভেতরের ফোয়ারা চত্বর থেকে জিপটিকে দড়ি ধরে টেনে মূল ফটক পর্যন্ত নিয়ে যান বঙ্গভবনের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ধীরগতিতে যখন জিপ এগোচ্ছিল, তখন দুই পাশ থেকে ফুল ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন বঙ্গভবনের কর্মীরা। এ সময় হাত নেড়ে আবদুল হামিদ অভিবাদনের জবাব দেন। জিপটির আগে ছিল একটি বাদক দল। তার সামনে ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। বাংলাদেশের প্রথম এই বিদায়ের আনুষ্ঠানিকতায় বঙ্গভবনের কমকর্তা-কর্মচারিদের অনেকে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। বঙ্গভবনের মূল ফটকে জিপ থেকে নেমে তাঁরা একটি গাড়িতে ওঠেন। গাড়িবহর বিদায়ী রাষ্ট্রপতিকে তাঁর নিকুঞ্জের বাসায় পৌঁছে দেয়।

একজন রাষ্ট্রপতির বিদায়ের আনুষ্ঠানিকতা দেখতে জাতিকে ৫২ বছর অপেক্ষা করতে হলো, এটা আসলে দুর্ভাগ্যজনক। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, এটা তো নিয়মিত ঘটনা হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা আসলে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতাটাই ঠিক করতে পারিনি। এরশাদের পতনের পর গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা শুরু হলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় রাষ্ট্রপতিরা আনুষ্ঠানিক বিদায় পাননি। আবদুল হামিদের বিদায়ের মাধ্যমে বঙ্গভবনে যে ইতিহাস রচিত হলো, আমাদের প্রত্যাশা ভবিষ্যতে তা বজায় থাকবে।

বাংলাদেশে সবকিছুই হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। নইলে আবদুর রহমান বিশ্বাস বা বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদও আবদুল হামিদের মতো বিদায় পেতে পারতেন। একজন রাষ্ট্রপতি একটি দলের মনোনয়নে নির্বাচিত হন বটে, কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর তারা আর দলের থাকেন না। রাষ্ট্রপতি আসলে সবার অভিভাবক। শুধু রাষ্ট্রপতি নন, প্রধানমন্ত্রীসহ সব মন্ত্রী, এমপিদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তারা দলের মনোনয়নে নির্বাচিত হলেও নির্বাচনের পর তারা সবার। শেখ হাসিনা কিন্তু শুধু আওয়ামী লীগ সমর্থকদের প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রধান নির্বাহী। দেশের সকল মানুষের সুবিধা-অসুবিধা দেখার দায়িত্ব তাঁর। মুখে যাই বলুক, বিএনপি নেতাকর্মীরাও নিশ্চয়ই সানন্দে পদ্মা সেতু সুবিধা নেন, মেট্রোরেলে চড়েন। একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যারা তাকে ভোট দিয়েছে, তাদেরও এমপি, যারা ভোট দেয়নি তাদেরও এমপি। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি সবাই 'অনুরাগ-বিরাগের বশবর্তী না হয়ে' আচরণ করার শপথ

নিতে হয়। তারপরও আমরা দেখি, বাংলাদেশে সবকিছু নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। এমনকি বিচারপতিদেরও মাপা হয়, কে কোন আমলে নিয়োগ পেয়েছেন, তা দিয়ে। আমলাদের পোস্টিং, পদোন্নতিও হয় রাজনৈতিক আনুগত্যের বিবেচনায়। এটা আমাদের দেশের গণতন্ত্রের এক বড় দুর্বলতা। বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে বগুড়ায় উন্নয়ন বেশি হয়, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে গোপালগঞ্জে। বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে চন্দ্রিমা উদ্যান চকচক করে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে ধানমন্ডি লেক।

২৪ এপ্রিল বঙ্গভবনে দু'টি ঘটনা ঘটেছে। একটি বিদায় আরেকটি বরণ। বিদায়ের ক্ষেত্রে যত ইতিহাসই রচিত হোক আমাদের আসলে সামনে তাকাতে হবে। ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন মো. সাহাবুদ্দিন। গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ার আগ পর্যন্ত এ পদের জন্য মো. সাহাবুদ্দিনের নাম শেখ হাসিনা ছাড়া আর কারো কল্পনায় ছিল না। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় পরদিন ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁকে ২ মাস ১০ দিন অপেক্ষা করতে শপথ নিয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য। এটা ঠিক রাষ্ট্রপতি হিসেবে নাম আসার আগ পর্যন্ত জনপরিসরে তিনি খুব পরিচিত ছিলেন না। তবে ছাত্রজীবন থেকেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অবিচল থেকেছেন। দলের প্রতি এই আনুগত্যই তাঁকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে আসীন করেছে।

মো. সাহাবুদ্দিন জীবনের আসলে চারটি অধ্যায়। ১৯৪৯ সালে পাবনায় জন্ম নেওয়া মো. সাহাবুদ্দিন ১৯৮২ সাল পর্যন্ত পাবনায়ই ছিলেন। পড়াশোনা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে রাজনীতি করেছেন পাবনার জেলা পর্যায়েই। ছাত্রলীগ, যুবলীগ, বাকশাল, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ করেছেন সক্রিয়ভাবে। পাবনায় সাংবাদিকতা ও আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে কারাভোগ করেছেন। সয়েছেন নির্মম নির্যাতন। কারাগারে ছিলেন তিন বছর।

১৯৮২ সালে শুরু হয় তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। বিসিএস (বিচার) ক্যাডারে যোগ দেন। ২৫ বছর চাকরি শেষে ২০০৬ সালে জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে অবসরে যান। ২৫ বছরের চাকরি জীবনেও তিনি আওয়ামী আদর্শে অবিচল ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় আইন মন্ত্রণালয় নিযুক্ত সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পরপর দুইবার বিসিএস (বিচার) অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন।

চাকরি জীবন শেষে জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে দেশজুড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর তাণ্ডব চালায়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই

বিদায়ী রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদকে ফুলেল শুভেচ্ছায় বিদায় জানান বঙ্গভবনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

তাণ্ডব তদন্তে একটি কমিশন গঠন করে, যার প্রধান ছিলেন মো. সাহাবুদ্দিন। সে দায়িত্ব শেষে তাঁকে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। দল, দেশ ও জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি তিনি পালন করেন দুদকের কমিশনার থাকার সময়। দুর্নীতির অভিযোগে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিল। বিশ্বব্যাংকের পথ ধরে অন্য উন্নয়ন সহযোগীরাও নিজেদের সরিয়ে নিলে বাংলাদেশ বিপাকে পড়ে। পদ্মা সেতু নির্মাণের চেয়ে তখন বড় হয়ে উঠেছিল দেশের ভাবমূর্তি। শেখ হাসিনার সাহসিকতায় নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ হয়েছে। শেখ হাসিনা সেই সাহসটা পেয়েছিলেন মো. সাহাবুদ্দিনের কাছ থেকে। দুদক কমিশনার হিসেবে তিনি তদন্ত করে প্রমাণ করেছিলেন পদ্মা সেতু প্রকল্পে কোনো দুর্নীতি হয়নি। তবে আওয়ামী লীগ সমর্থক কমিশনার তদন্ত করে বললেই সবাই সেটা মানবেন কেন। মানতে হয়েছে, কারণ দুদকের তদন্ত গ্রহণ করেছিল কানাডার আদালত। এভাবে আড়ালে থেকে তিনি দেশকে একটি বড় কলঙ্কের দায় থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

দুদক কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে গত ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে তিনি অন্যতম নির্বাচন কমিশনার ছিলেন। পরে তাঁকে দলের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য করা হয়। সর্বশেষ গত ২২ জানুয়ারি ঘোষিত বিভিন্ন উপ-কমিটির তালিকায় তিনি প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান। মো. সাহাবুদ্দিন বরাবরই আড়ালে থেকে দলের জন্য কাজ করেছেন। জীবনের প্রথম তিনটি পর্যায়ের ত্যাগের মূল্যায়ন করেই শেখ হাসিনা তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দিয়েছিলেন।

জীবনের প্রথম ৭৪ বছরের তিনটি পর্বে তিনি আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি অবিচল থেকেছেন। দেশকে রক্ষা করেছেন বড় কলঙ্কের দায় থেকে। তবে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার পর থেকে তিনি আর আওয়ামী লীগার নন। তিনি এখন রাষ্ট্রের প্রধান, সবার অভিভাবক, মহামান্য। অনুরাগ-বিরাগের ঊর্ধ্বে উঠে সবার প্রতি ন্যায্য আচরণের শপথ নিয়েছেন। সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধানের শপথ নিয়েছেন। যদিও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির 'ফিতা কাটা আর মাজার জিয়ারত' ছাড়া আর তেমন কিছু করার নেই, তবুও চাইলে রাষ্ট্রপতি অনেক কিছুই করতে পারেন। মো. সাহাবুদ্দিন এমন এক সময়ে দায়িত্ব নিলেন, যখন দেশ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রাজপথের প্রধান বিরোধী দল বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ব্যাপারে অনড়। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও সংবিধানের বাইরে কোনো সরকারের অধীনে নির্বাচন না দেওয়ার ব্যাপারে। রাজনীতি যখন পয়েন্ট অব নো রিটার্নে, এমন এক জটিল সময়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিলেন মো. সাহাবুদ্দিন। তাঁর সামনে এখন অগ্নিপরীক্ষা।

নতুন রাষ্ট্রপতির প্রথম কাজ হলো সব রাজনৈতিক দলের আস্থা অর্জন করা, জনগণের ভালোবাসা আদায় করা। নতুন রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'আমি রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখব, আমার করণীয় কী আছে। আমার করণীয় যা থাকবে, তা আমি করব। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, নির্বাচন অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে।' তিনি যদি দুই দলের দূরত্ব কমানোর উদ্যোগ নিতে পারেন, যদি সব দলকে নির্বাচনে আনতে পারেন, যদি একটি অংশগ্রহণমূলক, গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভূমিকা রাখতে পারেন; তাহলেই মো. সাহাবুদ্দিনের জীবনের চতুর্থ অধ্যায়টিও সাফল্যে মোড়ানো থাকবে। সেটা তাঁর জন্য যেমন, দেশের জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।